East West University
Plot No. A/2, Jahurul Islam City, Aftabnagar, Dhaka-1212
EAST WEST UNIVERSITY
LIBRARY

বণিক বার্তা
রেজি. নং : ডিএ ৬১০৮ ■ বর্ষ ০১, সংখ্যা ৩০৬ www.bonikbarta.com | সমৃদ্ধির সহযাত্রী

বণিক বার্তা, ২০২১-০৮-৩১, পৃঃ- ১৪ ও ১৮

বাংলাদেশ এখন এক সুদর্শন যুবক, হতে হবে বিচক্ষণ

ড. এ. কে. এনামুল হক

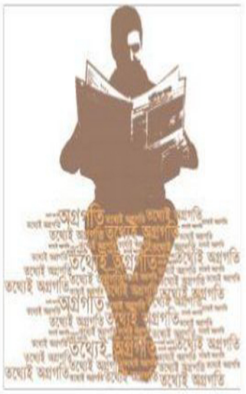

পঞ্চাশের বাংলাদেশকে হতে হবে বিচক্ষণ। তবে আমরা বসে নেই। বলেছি ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ তৈরি করেছে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন। ১৯৯৭ সালে চালু করেছে পরিবেশ সংরক্ষণ নীতমালা। কাগজে-কলমে এমন নীতিমালার কোনো জুড়ি নেই। মনে হবে উন্নত দেশ। বলা হয়েছে, যখন নদীতে ময়লা পানি ফেলবেন, তখন শর্ত মানতে হবে। খাওয়ার পানির ব্যবসা করবেন? থাকতে হবে মান। বাতাসে দূষণ মাত্রাও থাকবে নির্দিষ্ট মানের। শুধু তা নয়, বলা হয়েছে শব্দদূষণের মাত্রা কোথায় কত হবে

পঞ্চাশ বছরের বাংলাদেশ এখন এক সুদর্শন যুবক। কিন্তু জন্মের সময় তা ছিল না। বাংলাদেশ ছিল জীর্ণ-শীর্ণ একটি ক্ষুদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী। তবে তার মাথা ছিল উঁচু। নয় মাসের যুদ্ধে সে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছিল পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে। বলা বাহুল্য, সঙ্গে ছিল ভারত। যারা দিয়েছিল আশ্রয়, অর্থ ও প্রশিক্ষণ। মুক্তিযুদ্ধের আগের কথা ততটা সঠিকভাবে মনে নেই। তবে আমার মনে আছে আমাদের পয়োব্যবস্থাপনা ছিল বাসা থেকে প্রায় ১০০ গজ দূরে। পাকা কিন্তু এখনকার মতো ২৪ ঘণ্টা পানির ব্যবস্থা ছিল না। বলছি এ কারণে যে রাতে কখনো কারো পেটে চাপ পড়লে আমাদের যুদ্ধাবস্থায় পড়তে হতো। একজনকে বের হতে হতো বাতি নিয়ে (আমাদের বাসায় তখন বিদ্যুৎ বাতি জ্বলত রাত ৯টা পর্যন্ত), তার কাজ ছিল আলো দিয়ে অন্ধকার দূর করা। কিছু একটা শব্দ করা। হাততালি দেয়া। কারণ রাতে আশেপাশে লিওপার্ড বা চিতাবাঘ থাকতে পারে। সিলেটে আমাদের বাসার পেছনে ছিল বিশাল জঙ্গল। সেখানে ছিল হনুমান ও বানরের পাল। ছিল শিয়াল, চিতাবাঘজাতীয় প্রাণীর বিচরণ। আর ছিল সাপ। কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম সেখানে। দেখে মনে হলো বড় পাহাড়টা ছোট হয়ে গেছে। পাহাড়টা এখন চা বাগান। অর্থাৎ চা বাগানটি বড় হয়েছে। উৎপাদন বেড়েছে। এটাকে বলে প্রবৃদ্ধি। আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিধি বেড়েছে। কমেছে বন্য প্রাণিকুলের বিচরণ ক্ষেত্রে। সেই বানরের পাল নেই, নেই হনুমানের চিৎকার আর চিতাবাঘ? গত ২০ বছরেও কেউ দেখেনি। সে এখন বিলুপ্ত বা বিপন্ন প্রজাতি।

অর্থনীতি আর পরিবেশে এ প্রতিযোগিতা অনেক পুরনো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা যেমন বাড়তে থাকে, তেমনি বাড়তে থাকে কীটনাশকের ব্যবহার। এরই একটি কীটনাশকের নাম ছিল ডিডিটি। তাতে মারা যেত পোকামাকড়। শস্যক্ষেতে পাখির বসবাস থাকে। তাদের কাছে মরে যাওয়া পোকামাকড় ছিল মজাদার খাবার। কিন্তু তাতেই ঘটেছিল বিপত্তি। পাখির ডিমের খোসা হচ্ছিল না। তখন আমাদের কৃষকরা বালাইনাশক ব্যবহারে ছিলেন অক্ষম। মাঝেমধ্যে প্লেনে করে ডিডিটি ছিটিয়ে দিত। অনেকের মনে থাকতে পারে, সে সময় আমাদের দেশেও কখনো কখনো মুরগির ডিমে খোসা হতো না। কারণ আমরাও ডিডিটির যথেচ্ছ ব্যবহার করতাম, বাড়ির আঙিনার সবজির বাগানে। যাহোক খোসাবিহীন ডিমে পাখির বাচ্চা হতো না। অনেক অঞ্চল পাখিশূন্য হয়ে গিয়েছিল। তা দেখেই রাচেল কারসন লিখেছিলেন 'নীরব বসন্ত' নামে একটি বই। উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে কীটনাশকের ব্যবহারে সতর্কবার্তা দেয়া। পরিবেশবিষয়ক আন্দোলন সেখান থেকেই শুরু। ১৯৬২ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে শুরু হয় পরিবেশবিষয়ক সম্মেলন। তখন আমাদের পরিবেশ মূলত ছিল রাসায়নিক দূষণমুক্ত। দেশটি ছিল কৃষিভিত্তিক। শিল্প বলতে ছিল আদমজীর পাটকল কিংবা খুলনার কাগজের কল। বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যায় মানুষ সাঁতার কাটতে পারত। মাছ ধরতে পারত। পরিবেশ বিষয়ে আমাদের ছিল একটিই সমস্যা, তা হলো পানিতে ফলমূত্র ত্যাগ আর তার ফলে সৃষ্টি হতো কলেরা মহামারী। বুঝতে পারছেন পরিবেশ সমস্যা সব দেশে এক ছিল না। পঞ্চাশ বছর পর বাংলাদেশ প্রায় শতভাগ লোককে মলমূত্র ত্যাগের সঠিক ব্যবস্থাপনায় নিয়ে এসেছে। এখন কলেরা মহামারী সুদূর অতীতের সংবাদ। ওলাউঠা? কেউ নামই শুনেনি এ প্রজন্মের।

২. এখন বুড়িগঙ্গার অবস্থা সঙ্গিন। আমাদের শীতলক্ষ্যা নদী দূষিত। তুরাগকে নদ বলা মুশকিল। বংশীর বংশই নেই। এগুলো থেকে পানি শোধন করা প্রায় অসম্ভব। পরিবেশ বিষয়ে নব্বইয়ের দশক থেকে আমাদের সচেতনতা বেড়েছে। ১৯৯৫ সালে আমরা করেছি পরিবেশ সংরক্ষণ আইন। ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিপত্র অনুযায়ী শীতকালে বুড়িগঙ্গা আর নদী থাকে না। পরিণত হয় পয়োপ্রণালিতে। শুধু তাই নয়, কপোতাক্ষ নদ এখন ভূমিতলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। তলানিতে পলি জমে জমে তা পূর্ণ হয়ে গেছে। পদ্মায় এখন অথই বালির ঢেউ। নদীপ্রবাহ শীতকালে ক্ষীণ। তিস্তা পরিণত হয়েছে ক্ষুদ্র প্রণালিতে। অর্থাৎ ধীরে ধীরে আমাদের সেই নদ-নদী দূষিত হয়েছে অথবা পানিশূন্য হয়েছে। শুধু তাই নয়, একসময় আমাদের বাতাস ছিল স্বচ্ছ। শ্বাস-প্রশ্বাস নিলে বাতাসে ফুলের গন্ধ ভেসে আসত। তা এখন আর নেই। ধূলাবালিতে তা এখন পরিপূর্ণ। শহরে জন্মেছে এমন শিশুর হাঁপানি হবেই। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে নানা রাসায়নিক দ্রব্য। শহরের রাস্তায় অতিদ্রুত গাড়ি চলে আর তাই চালকরা শক্ত শক্ত ব্র্যাক করে থাকেন। তাছাড়া রাস্তার মান খারাপ হওয়ায় গাড়ির চাকার আয়ু কমে আসে। বলতে পারেন এ চাকা ক্ষয় হয়ে কোথায় যায়? একটি গবেষণায় দেখা গেছে ক্ষয়ে যাওয়া সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ বাতাসেই এখন ভেসে বেড়ায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় তা আমরা প্রতিনিয়ত গ্রহণ করি। গবেষণা বলছে, এ কণার মাত্রা এখন পৃথিবীর সর্বোচ্চ। ফলে কণাগুলো আমাদের ফুসফুসে জমে গিয়ে প্রদাহ দেখা দিচ্ছে। কেবল যে সিগারেট তা নয়, বাতাসে ভেসে বেড়ানো এসব কণাও ফুসফুসে প্রবেশ করলে ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। ৫০ বছরে দেশের বয়স বাড়ছে বটে, তবে বাতাসের বয়স বাড়লে চলবে না। পানির দূষণ বাড়লে চলবে না। নদী অচল হলে চলবে না। কারণ? তাতে আমাদের আগামী প্রজন্মের স্বাস্থ্যের হানি হবে। দেশে উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির বদলে ক্ষয় হবে। তখন আমরা উৎপাদনের পেছনে যতটা না ব্যয় করব, স্বাস্থ্যের পেছনে তার চেয়ে বেশি খরচ করব। যতদিন কাজ করব, তার চেয়ে অধিক দিন অসুস্থ থাকব। অর্থাৎ পরিবেশ দূষিত হলে আমাদের কর্মক্ষমতা হ্রাস পাবে। আমরা আবারো গরিব হব। অনেকে দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমাবে। বলবে ছেলেপেলের ভবিষ্যৎ! তাই চললাম। যারা পারবে না, তারা ধুঁকতে থাকবে।

৩. চিত্রগুলো একেবারেই কল্পনা নয়। আগেই বলেছি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে দূষণের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তাই যখনই বলবেন আমাদের জাতীয় আয় বাড়ছে তখনই সতর্ক হবেন, আমরা কি সঠিক পথে আছি? আমরা কি দূষণ নিয়ন্ত্রণ করছি? আমাদের দেশটা বুড়ো হচ্ছে না? দেশের পরিবেশ দূষিত হলে দেশের উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়। আগামীতে আকাল সৃষ্টি হয়। তখন টেকসই বাংলাদেশ থাকবে না।

পঞ্চাশের বাংলাদেশকে তাই হতে হবে বিচক্ষণ। তবে আমরা বসে নেই। বলেছি ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ তৈরি করেছে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন। ১৯৯৭ সালে চালু করেছে পরিবেশ সংরক্ষণ নীতমালা। কাগজে-কলমে এমন নীতিমালার কোনো জুড়ি নেই। মনে হবে উন্নত দেশ। বলা হয়েছে, যখন নদীতে ময়লা পানি ফেলবেন, তখন শর্ত মানতে হবে। খাবার পানির ব্যবসা করবেন? থাকতে হবে মান। প্রথমত পানির আধার অর্থাৎ যেখান থেকে পানি তুলবেন যেমন নদী, তার পানি হতে হবে নির্দিষ্ট মানের আর সরবরাহকৃত পানিও হতে হবে একটি নির্দিষ্ট মানের। বাতাসে দূষণ মাত্রাও থাকবে নির্দিষ্ট মানের। শুধু তা নয়, বলা হয়েছে শব্দদূষণের মাত্রা কোথায় কত হবে। শিল্প এলাকায় শব্দদূষণের মান কত হতে হবে, বাণিজ্যিক এলাকায় কী হবে, আবাসিক এলাকায় কী হবে। নীরব এলাকায় কী হবে। অর্থাৎ এর চেয়ে বেশি দূষণ অগ্রহণীয়। কিন্তু বলা নেই, দূষণের মান খারাপ হলে শোধন কে করবে? কে কী ব্যবস্থা নেবে? এ মানদণ্ডের কি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে?

পরিবেশ ব্যবস্থাপনা একটি জটিল বিষয়। একদল দূষণ করে। কারণ উৎপাদন করতে দূষণ হবেই। তাই পরিবেশ আইন প্রণয়ন করা হয় কয়েকটি উদ্দেশ্য সামনে রেখে। এক. যারা দূষণ করবেন, তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা। তাদের দূষণের মাত্রা কমিয়ে আনার চেষ্টা করা। দুই. যারা দূষণের কারণে ভুক্তভোগী হবেন, তাদের রক্ষা করার ব্যবস্থা করা। দূষণ নিয়ন্ত্রণে তাই একটি বহু পুরনো পদ্ধতি হলো প্রমিত মান সৃষ্টি করা। উদাহরণ দিই। আমাদের গাড়ির ফিটনেস নীতিতে বলা হয়েছে যে গাড়ি রাস্তায় চালাতে হলে কালো ধোঁয়ার মাত্রা ৬৫ এককের বেশি হতে পারবে না। বলা হয়েছে, কার্বন মনোঅক্সাইডের নিঃসরণের মাত্রা প্রতি কিলোমিটারে ২৪ এককের বেশি হতে পারবে না। বলা হয়েছে নাইট্রোজেন অক্সাইডের নিঃসরণের মাত্রা প্রতি কিলোমিটারে ২ এককের বেশি হবে না। আপনার কি মনে হয়, আমাদের দেশে কেউ তা মানে কিংবা কোথাও কেউ তা মেপে দেখে? এটা একটি অবাস্তব চিন্তা। প্রথমত, এ নিয়ম পালন করতে গেলে প্রতিটি গাড়ির ফিটনেস করতে যে পরিমাণ সময় যাবে, তাতে ঢাকায় কাউকে গাড়ি চালাতে হবে না। সবাইকেই বিআরটিএ-তে বসে থাকতে হবে। এত কিছু পরিমাপ করা তাদের ক্ষমতার বাইরে। যদি আমরা উন্নত দেশ হয়ে যাই, অর্থাৎ আমাদের ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা যদি কোনো উন্নত দেশের সমান হয়, তখন কি মোড়ে মোড়ে গাড়ির ফিটনেস দোকান তৈরি হবে?

এবার ধরুন গাড়ি তৈরির কোম্পানিগুলো জানে তাদের গাড়িতে আরো কম দূষণ তৈরি করার মতো প্রযুক্তি সংযোজন করা সম্ভব, তখন তারা কি তা করবে? কখনই না, কারণ দূষণের মাত্রা কমিয়ে তাদের কোনো বিশেষ সুবিধা হবে না, বরং গাড়ি তৈরির খরচ বাড়বে। তাই দেখবেন বছরের পর বছর প্রমিত মাত্রার পরিবর্তন হয় না কিংবা দূষণ নিয়ন্ত্রণের নতুন প্রযুক্তি বাজারে আসে না। আমাদেরও এসব মান ১৯৯৭ থেকে আর বদলায়নি। এ বন্ধ্যত্বের মূল কারণ এ ধরনের দূষণ মাত্রার প্রমিতকরণ নীতি। অন্যভাবে বলি। ধরুন, ঢাকার পাশে শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠা করার ফলে নদীর পানি দূষিত হয়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এখন থেকে শিল্পদূষণ কমাতে হবে। কী করে করবেন? জোর করে শিল্প-কারখানা সরাতে পারেন, তবে তাতে লাভ হয় না। যেমনটি হয়নি আমাদের চামড়া শিল্প সরিয়ে। আমাদের বুড়িগঙ্গা কি জেগে উঠেছে? তার পানির মান কি ফিরেছে? ফেরেনি। কারণ দূষণ একা এ শিল্প করেনি। বরং তার পেছনে ছুটতে গিয়ে আমরা অন্যদের দিকে তাকাইনি। ভেবেছি বুড়িগঙ্গার বারোটা বাজিয়েছে চামড়া শিল্প। ২০১০ সালের দিকে আমি একটি গবেষণায় জড়িত ছিলাম। তখন আমরা দেখেছি যে ঢাকার আশেপাশের সব কলকারখানা বন্ধ করে দিলেও বুড়িগঙ্গার পানি পরিষ্কার হবে না।

তাই দেখবেন অর্থনীতিবিদ, যারা সাধারণত সরকারের নীতিমালা তৈরিতে পারদর্শী, তাদের সঙ্গে অন্যদের মতের বিশাল পার্থক্য থাকে। ২০০৬ সালে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় পরিবেশ অধিদপ্তরের আমন্ত্রণে শিল্প-কারখানায় তরল বর্জ্য পরিশোধন করার ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য একটি আলোচনায় বসেছিলাম। সবারই মতামত ছিল—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তরল বর্জ্য (শোধন করার ব্যবস্থা প্রতিটি শিল্পে (বিশেষত দেশের গার্মেন্ট শিল্পে) স্থাপন করতে হবে। নচেৎ অধিদপ্তর পরিবেশ ছাড়পত্র দেবে না। আমিই ছিলাম একমাত্র অর্থনীতিবিদ। ফ্লোর নিয়ে বললাম, বিদেশীদের চাপে আপনারা এ ব্যবস্থা করছেন বটে, তবে তাতে শেষ পর্যন্ত শিল্প মালিকদের ঋণের বোঝাই বাড়বে, আপনারা ছাড়পত্র দেবেন কিন্তু দূষণ কমবে না। এতে দেশের ক্ষতি হবে। এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা রয়েছে সেই চিন্তা করুন। শিল্প মালিকদের অনেকেই আমার সঙ্গে একমত হলেন কিন্তু আমলারা হলেন না। কারণ তাদের প্রস্তাবিত নিয়ম তাদের ক্ষমতা বাড়ায়, ক্ষমতা দুর্নীতির মাত্রা প্রসারিত করে। তারও আগের আরেকটি উদাহরণ দিই। সরকারের উচ্চস্তরে আন্তর্জাতিক পুরস্কারের লোভ তৈরি হয়েছে। সরকার ঘটা করে পলিথিনের ব্যাগ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা চালু করবে। যেদিন চালু হলো সেদিন বাংলাদেশের সব পরিবেশ এনজিও পোস্টার ছেপেছে। ফেস্টুনে ফেস্টুনে ঢাকা ঢেকে ফেলেছে। আমি পরিচিত এক বিজ্ঞ ও পরম শ্রদ্ধেয় পরিবেশবিদকে ফোন করে জিজ্ঞেস করলাম, দেখুন এ নিয়ম কাজে আসবে না। কেন আপনারা টাকার শ্রাদ্ধ করছেন? ঢাকার জলাবদ্ধতার মূল কারণ পলিথিন নয়। মূল কারণ দুটি—এক. আবর্জনা পরিষ্কারে সিটি করপোরেশনের অক্ষমতা এবং দুই ঢাকার বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থায় দায়ীহীনতা। কারো দায় নেই বর্জ্য নিষ্কাশনে। পলিথিন থাকুক কিংবা না থাকুক জলাবদ্ধতা দূর হবে না। উত্তরে বললেন, আপনার সঙ্গে আমিও একমত কিন্তু মন্ত্রী ফোন করে বলেছেন যেন পোস্টার ছেপে প্রচার করি। তাই করতে হলো।

৪. তাহলে কী করা যায়? সম্প্রতি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক আমাদের একটি বই প্রকাশ করেছে। বছর তিনেক আগে তারা আমাদের কয়েকজনকে বলেছিল পরিবেশ দূষণ কমাতে নানা দেশে নানা নিয়ম। তার একটি পর্যালোচনা করে দিন। তাতে নীতি প্রণয়নকারীরা উপকৃত হবে। ভালো নীতিমালা চালু হতে পারে। আমরা দেখিয়েছি কী করে সবচেয়ে কম খরচ করেও অনেক ভালো নিয়ম চালু করা যায়। দেশের

এরপর পৃষ্ঠা ১৮

East West University
EAST WEST UNIVERSITY
LIBRARY
Plot No. A/2, Jahurul Islam City, Aftabnagar, Dhaka-1212

বণিক বার্তা
রেজি. নং : ডিএ ৬১০৮ ■ বর্ষ ০১, সংখ্যা ৩০৬ www.bonikbarta.com | সমৃদ্ধির সহযাত্রী

বণিক বার্তা, ২০২১-০৮-৩১, পৃঃ- ১৪ ও ১৮

বাংলাদেশ এখন এক সুদর্শন যুবক, হতে হবে বিচক্ষণ

● ১৪ পৃষ্ঠার পর

অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি বজায় রেখে কী করে ক্রমে দূষণ কমানো যায়। তাতে দূষণকারীরা নিজে স্বার্থেই দূষণমাত্রা কমানোর প্রযুক্তি চালু করতে উৎসাহী হবে। কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করি। এশিয়ারই একটি দেশে চালু করেছে 'দূষণ চার্জ'। আপনি যখনই কোনো ব্যাটারিচালিত যন্ত্র কিনবেন, তার সঙ্গে রয়েছে দূষণ চার্জ। সব যন্ত্রের দূষণ চার্জ এক নয়। আপনি যন্ত্রটি কেনার সময় তার দামের সঙ্গে ব্যাটারি পুনর্ব্যবহারের জন্য একটি কর যুক্ত করে দিয়েছেন। তাতে ব্যাটারিচালিত যন্ত্রের দাম বেশি হবে। তবে এ টাকার একটি অংশ চলে যায় দেশের প্রতিটি নগরে, তারা যেন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যাটারিগুলোকে পৃথকভাবে সংগ্রহ করে ফেরত নিয়ে আসে। সরকার কোম্পানিকে বলেছে তাদের উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট অংশ পুনর্ব্যবহার করা উপাদান দিয়ে তৈরি করতে হবে। তাতে তাদের উৎপাদন খরচ বাড়বে, তাই চার্জের আরো একটি অংশ দিয়েছে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে, যাতে তারা নিজেরা পুনর্ব্যবহারে উৎসাহী হয়। আর কেউ পণ্যটি আমদানি করে থাকলে সেই পণ্যের ক্ষেত্রে এ টাকা তারা সরকারি কোষাগারে জমা দেবেন। যদি তারা তাদের যন্ত্রাংশ ফেরত আনতে পারে, তবে তা একটি অংশ তারা ফেরত নিতে পারবেন। অর্থাৎ ব্যাটারি ফেরত আনার জন্য তারাও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। আবার পণ্যটির উৎপাদনে পুনর্ব্যবহারকৃত উপাদান না থাকলে চালু করেছে অতিরিক্ত সার চার্জ। ফলে দেশের নদ-নদী কিংবা মাটি ভয়ংকর দূষণের হাত থেকে বেঁচে যাবে। আরো একটি নিয়ম বলি। দূষণ বিক্রয় করার নীতি। অর্থাৎ আপনার দূষণ অধিকার বিক্রয় করার নীতিমালা। আমরা জানি, উৎপাদন কখনই দূষণবিহীন হয় না। তাই যখনই কোনো শিল্প-কারখানা স্থাপনে অনুমতি দেয়া হয় তখনই প্রকারান্তরে দূষণের অধিকার তাকে দেয়া হয় (অবশ্যই নিয়মের মধ্যে)। ধরুন, বলা হলো উৎপাদনকারী তার উৎপাদন করতে গিয়ে যত ধরনের দূষণ করবে, তার একটি পৃথক অনুমতিপত্র দেয়া হবে এবং বলা হবে যে ইচ্ছে করলে সে এ অনুমতিপত্রটি বিক্রয় করে দিতে পারে। নিয়মটি সেখানেই চালু হয়, যেখানে দূষণ মাত্রা নিয়ন্ত্রণ জরুরি। তাতে অত্যন্ত দূষিত অঞ্চলও ক্রমে দূষণমুক্ত হয়। ফলে পরিবেশ বিভাগ জানে তারা কী পরিমাণ দূষণের ছাড়পত্র দিয়েছে। যদি মোট ছাড়কৃত দূষণ প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করে, তবে নতুন করে আর কোনো শিল্প স্থাপনের ছাড়পত্র তার দেবে না। কিন্তু যারা দূষণ ছাড়পত্র পেয়েছে, তারা তাদের দূষণ বিক্রয় করে দিতে পারবে। ফলে শিল্প মালিক বুঝতে পারে এক, যদি সে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতে চায় তখন তাকে নতুন করে দূষণ ছাড়পত্র নিতে হবে অথবা তার উৎপাদন একক প্রতি দূষণের মাত্রা কমাতে হবে। সে তখন দূষণমুক্ত প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করবে। অর্থাৎ তার নিজের দূষণের পরিমাণ কমিয়েই সে উৎপাদন বাড়াতে পারবে। আর কোনোভাবেই নয়। আবার মনে করুন অন্য একটি শিল্প এ এলাকায় উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় অথবা দূষণ মাত্রা কমানোর কোনো প্রযুক্তি পাওয়া যাচ্ছে না, তখন সে যাদের দূষণ ছাড়পত্র রয়েছে, তাদের থেকে দূষণের অধিকার কিনে নিতে পারে। এমনও হতে পারে, যে শিল্পটি তাদের ছাড়পত্র বিক্রি করল, তারা হয় শিল্পটিকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করবে অথবা সে দূষণ কমানোর প্রযুক্তি ব্যবহার করবে। একদিকে উন্নত প্রযুক্তি দ্বারা দূষণ কমাতে পারে আর বেঁচে যাওয়া দূষণের সমপরিমাণ ছাড়পত্র নতুন শিল্পের কাছে বিক্রয় করে দিতে পারে। এভাবেই কার্বন বাণিজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে শিল্পপ্রতিষ্ঠান যদি উৎপাদন বাড়াতে চায়, তবে সে কেবল দূষণ কমিয়েই তা করতে পারে। তাতে সবচেয়ে কম খরচে দূষণ কমানো সম্ভব।

ভারতে বহু কয়লাবিদ্যুৎকেন্দ্র ইট উৎপাদনকারীদের ছাই দিয়ে থাকে কেবল বিনে পয়সায়ই নয়, অনেক ক্ষেত্রে নিজের পয়সায় এ ছাই তারা তাদের কারখানায় পৌঁছে দেয় কিংবা টাকা দিয়ে দেয় যেন তারা ছাই নিয়ে যায়। নেপালের একটি শহরে নগরপিতা বলেছেন, আপনার ঘরের কেবল অপচনশীল বর্জ্য আমরা নেব। পচনশীল বর্জ্য দিয়ে সার বানিয়ে নিজেরাই ব্যবহার করুন। আজকাল নিজের ঘরের ভেতরেই দুর্গন্ধহীনভাবে নিজের বর্জ্য দিয়ে জৈব সার তৈরি করা যায়। সিলেট শহরে আমরা তিনটি পাড়ায় তা করিয়ে দেখিয়েছি। পাড়ার বর্জ্য পাড়াতেই সারে পরিণত করা যায়। তাও দুর্গন্ধহীনভাবে। মুম্বাইয়ে নতুন কোনো অ্যাপার্টমেন্ট থেকে এখন আর বর্জ্য নেয়া হয় না। কারণ বর্জ্য ফেলাই এখন এক বিশাল খরচের বিষয়। আমাদের গৃহস্থালি বর্জ্যের প্রায় ৯০ শতাংশই পচনশীল। ভাবুন যদি বর্জ্য ব্যবস্থাপকরা পচনশীল বর্জ্য না নিয়ে যায়, তখন তাদের কত টাকার সাশ্রয় হবে। আর আপনি কী পরিমাণ জৈব সার তৈরি করতে পারেন। এ জৈব সার জমিতে দিয়ে কী পরিমাণ রসায়নিক সারের ব্যবহার কমানো যায়? সেই সঙ্গে কিডনি রোগীর সংখ্যা কমে যাবে। রসায়নিক সার কিডনি রোগের কারণ বলে এখন প্রমাণিত।

সব শেষে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এখন বহু দেশে কোটি টাকার ব্যবসা। বর্জ্যকে পণ্যে পরিণত করতে প্রয়োজন বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নীতি প্রণয়ন। এসব নীতিকে বলা হয় প্রণোদনাভিত্তিক নীতিমালা। প্রশাসনিক নীতিমালা দিয়ে পরিবেশ রক্ষা করা যে অসম্ভব, তা এখন চোখ বন্ধ করে বলে দেয়া যায়। আমাদের প্রয়োজন প্রণোদনাভিত্তিক নীতিমালা প্রণয়ন, যেখানে কেবল পরিবেশ রক্ষা হবে না, উত্তরোত্তর পরিবেশের মান উন্নয়নে সবাই উৎসাহিত হবে। আশা করি ভাববেন।

ড. এ. কে. এনামুল হক : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ ও পরিচালক, এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট